স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

১৫ তম
বর্ষ ২০১৩

- ডেঙ্গু জ্বরে করণীয়
- বয়ঃসন্ধিতে ব্রণ
- পেপটিক আলসার
- মেনোপজ
- পিত্তথলির পাথর
- চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির অবদান

ISSN 1682-0541

স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

সূচী

ডেঙ্গু জ্বরে করণীয়	....	০১
বয়ঃসন্ধিতে ব্রণ	....	০৩
পেপটিক আলসার	....	০৪
মেনোপজ	....	০৮
পিত্তথলির পাথর	....	১০
চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির অবদান	....	১৩

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

বরাবরের মত এবারও আপনাদের প্রিয় স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী ‘‘স্কয়ার” প্রকাশিত হল। আমাদের এ সংখ্যায় রয়েছে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় এবং চমকপ্রদ সংযোজন। আশা করি সবগুলো বিষয় পড়ে আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজে আসবে।

বিভিন্ন সময়ে আপনাদের পাঠানো মতামত আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা যথাযথ তথ্য প্রকাশে সচেষ্ট থাকি। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত বাংলা ‘‘স্কয়ার” এর উত্তরোত্তর উন্নতিতে সহায়তা করবে।

পরিশেষে, ‘‘স্কয়ার” পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

১৫তম বর্ষ, ২০১৩

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

সহযোগী সম্পাদকমন্ডলী
ডাঃ এ এস এম শওকত আলী
ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী
ডাঃ রেজাউল হাসান খান
ডাঃ মোঃ মোসাদ্দেক হোসাইন
ডাঃ নুরা আফতাব সিদ্দীক
ডাঃ এ. এস.এম. শাহনেওয়াজ
ডাঃ মোঃ শাহরিয়ার কবির রবিন

সহযোগিতায়
প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1682-0541
Key title: Skayara

ডেঙ্গু জ্বরে করণীয়

ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever) হল এডিস (*Aedes aegypti*) মশাবাহিত ভাইরাসজনিত এক ধরনের তীব্র জ্বর। আমাদের দেশে সংক্রমনজনিত জ্বরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আঠার শতকের শেষদিকে এই জ্বর বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত হয়। তখন ইহা ঢাকা ফিভার (Dacca Fever) নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশসহ এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত ও শ্রীলংকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান ও উষ্ণমন্ডলীয় দেশে এই রোগ বেশী হয়।

- এই মশা ঘরে, বাইরে প্রায় সব জায়গাতেই থাকতে পারে। তবে বাড়ির ভেতর এদের বসবাস বেশি। কারণ পরিস্কার জমানো পানি এদের বেশী পছন্দ। এরা সাধারণত পরিস্কার, বদ্ধ জলাধার এবং পরিস্কার আবদ্ধ পানিতে ডিম পারে। ফুলের টবে জমানো পানি, ফুলদানীর পানি, ফ্রিজের নীচে ট্রেতে জমা পানি, ফেলে দেয়া পুরনো টায়ার, টিনের কৌটা, বিভিন্ন ধরনের পরিত্যাক্ত পাত্র যাতে বৃষ্টির পানি জমা থাকে- এসব স্থানে এই মশা ডিম পারে। তবে চলমান পানি যেমন- ড্রেন, নদী, পুকুর ইত্যাদি জায়গায় এডিস মশা ডিম পারে না।

ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে -

১. ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর

২. হেমোরেজিক ডেঙ্গু জর

ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস নামক এক ধরনের স্ত্রী মশা এই জ্বরেরও বাহক। দু'ধরনের এডিস মশা বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। এরা হলো ১. এডিস ইজিপটাই ২. এডিস এলবোপিক্টাস। এছাড়া ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ রয়েছে ঃ এগুলো হচ্ছে- DENV-1, DENV-2, DENV-3 এবং DENV-4। এদের মধ্যে DENV-2 এবং DENV-3 বেশী মারাত্মক।

এডিস মশার বৈশিষ্ট্য

এডিস মশা দেখতে গাঢ় নীলাভ কালো রঙের হয়ে থাকে। এই মশার সারা শরীরে সাদা সাদা ডোরা কাটা দাগ আছে। এছাড়াও এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

- পৃথিবীর উষ্ণ ও উপ-উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।
- এডিস মশা অনেক উঁচুতেও চলাচল করতে সক্ষম। সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উপরেও এডিস মশার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় সাধারণত এরা ডিম পারে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। শুকনো অবস্থায়ও এডিস মশার ডিম প্রায় বছর খানেক টিকে থাকতে পারে।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। তাই দিনের বেলা মশারি টানিয়ে ঘুমানো উচিত।

ডেঙ্গু জ্বর কিভাবে ছড়ায়

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী এডিস ইজিপটাই মশা কোন ব্যক্তিকে কামড় দিলে সেই ব্যক্তি ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এবার এই আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে জীবাণুবিহীন কোন এডিস মশায় কামড় দিলে সেই মশাটিও ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। পরে এই মশা যখন অন্যকে কামড় দেয় তখন তার দেহে আবার ভাইরাস সংক্রমিত হয় এবং ব্যক্তিটি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মানুষ-মশা-মানুষ চক্র চলতে থাকে।

ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে যে সব উপসর্গ দেখা যায় সেগুলো হল -

- তীব্র জ্বর যা ১০৪° থেকে ১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
- জ্বরের সাথে প্রচন্ড মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, বমি এবং পেটব্যথা থাকে।
- কোমড় ও অস্থিসন্ধিতেও ব্যথা (Joint Pain) হতে পারে।
- অনেক সময় শরীরের ত্বকে এলার্জি র‍্যাশের মতো র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। এই র‍্যাশগুলো কখনো কখনো চুলকানির উদ্রেক করে থাকে।
- জ্বর সাধারণত ৫/৭ দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়।

হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরে যে সব উপসর্গ দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে -

- এক্ষেত্রে জ্বর খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

- ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলোই এক্ষেত্রে আরো তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। বিশেষ করে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত, চোখের সাদা অংশে জমাটবাধা রক্ত, নাক দিয়ে রক্তপাত, ত্বকের নীচে জমাটবাঁধা রক্তের নমুনা, রক্তবমি, পায়খানার সাথে কালো রক্ত যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিয়ে থাকে।
- এমনকি মস্তিষ্কেও রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- রক্তক্ষরণের ফলে রোগী অজ্ঞান (Shock) হয়ে যেতে পারে। এমনকি রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। এক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ডেঙ্গু জ্বরে কিছু কিছু শ্বেতকনিকা (Leukocytes), অনুচক্রিকা (Platelets) এবং ই. এস.আর (ESR) কমে এবং লিভার এনজাইম ও এ্যন্টিবডি (Antibody) বেড়ে যায়। রক্তের ডেঙ্গু ভাইরাস এ্যন্টিবডি পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর নিশ্চিত হওয়া যায়। রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষাগুলো বার বার করতে হয়, তবে জ্বরের তৃতীয় দিনে করা ভাল। এ্যন্টিবডি টেস্ট পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে করা উত্তম।

চিকিৎসা

ডেঙ্গু জ্বরের এখনো কোন কার্যকরী চিকিৎসা নেই। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত এমনিতেই ৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। জ্বর এবং ব্যথার জন্য শুধুমাত্র প্যারাসিটামল দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া এই জ্বরে প্রচুর পানি পান করতে হয়। জ্বর সেরে যাওয়ার পর রোগীর দুর্বলতা ও ক্ষুধামন্দা কেটে যেতে কিছুদিন সময় লাগে।

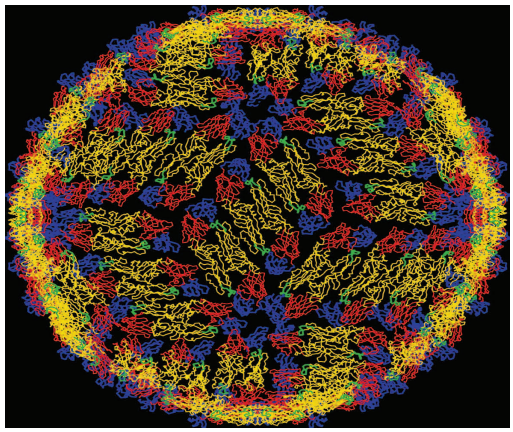

অনুবীক্ষন যন্ত্রে দেখা ডেঙ্গু ভাইরাসের নমুনা

হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর সন্দেহ হলে রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডেঙ্গু জ্বরের রোগীর ব্যথার জন্য এসপিরিন বা NSAIDs জাতীয় ওষুধ কোনভাবেই দেয়া যাবে না। এতে করে রক্তক্ষরণের প্রবণতা বেড়ে যায় এবং রোগীর অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করে।

ডেঙ্গু জ্বরে সতর্কতা

জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরই সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ বিষয়ে ডেঙ্গু রোগীদের সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণ জ্বরের ক্ষেত্রে জ্বর কমে যাওয়া মানেই হচ্ছে কিছুটা সুস্থ বোধ হওয়া। কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বরং জ্বর সেরে যাওয়ার পরই রোগীর প্রতি অধিক যত্নশীল ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ সময় রোগীর যদি নাক, মাড়ি অথবা শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে রক্তপাত দেখা দেয় কিংবা ত্বকের নীচে লাল চাকার মতো কিছু ভেসে ওঠে এবং পেটব্যথা শুরু হয় তাহলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে অথবা হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

প্রতিরোধই উত্তম

যেহেতু ডেঙ্গু জ্বরের কোন কার্যকর চিকিৎসা এবং ভ্যাকসিন নেই তাই এর প্রতিরোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই মুখ্য। ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিধনই হচ্ছে আসল কাজ।

- যেসব জায়গায় ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী এডিস মশা বংশবৃদ্ধি করে, সেসব জায়গা প্রতিদিন পরিস্কার রাখতে হবে।
- বাড়ির যে কোন জায়গায় টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, বোতল, নারিকেলের খোসা, ক্যান অথবা এ ধরনের যে কোন পাত্র যেখানে পানি জমতে পারে, সেগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ফুলের টব বা ফুলদানীতে যেন জমানো পানি না থাকে।
- দিনের বেলা ঘুমালে অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে।
- সর্বোপরি জনসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সক্রিয় ভূমিকা সবচেয়ে বেশী জরুরী।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

বয়ঃসন্ধিতে ব্রণ

ব্রণ (Acne) একটি সাধারণ চর্মরোগ যাহা বয়ঃসন্ধিকালে দেখা যায়। প্রায় ৮৫% লোক বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণের সমস্যায় ভোগে, নারী পুরুষ উভয়েরই ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগটি প্রকট ভাবে দেখা দেয়। সাধারনত ২৫ বছর বয়সের মধ্যে রোগটি এমনিতেই সেরে যায়। ১২% মহিলা এবং ৩% পুরুষ ৪৪ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রণে আক্রান্ত হতে পারে।

ব্রণ শরীরের রোমগ্রন্থির একটি রোগ, ব্রণের প্রাথমিক ক্ষতকে কমেডোন (Comedone) বলা হয়। কমেডোনের পাশাপাশি গোঁটা (Papule) পূজসহ গোঁটা (Pustule) হতে পারে, গোঁটার মুখ যদি খোলা থাকে এবং কালো ক্যারাটিন (Keratin) জাতীয় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে সেই জাতীয় গোঁটা কে খোলা গোঁটা বা ব্ল্যাকহেড (Blackhead) বলে। হলুদ বর্ণের গোঁটা যার মুখ বন্ধ থাকে তাকে বন্ধ গোঁটা বা হোয়াইটহেড (Whitehead) বলে।

বয়ঃসন্ধিকালের ব্রণ আসলে শরীরে কিছু কিছু হরমোন (Sex hormone) তৈরীর বহিঃপ্রকাশ। সাধারণত ১৫-১৬ বছর বয়সে যখন এই হরমোন অত্যধিক হারে বেড়ে যায় তখন প্রদাহ জনিত ব্রণ দেখা দেয়। মহিলারা যদিও অধিকহারে ব্রণে আক্রান্ত হয় তবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় পুরুষরা। তৈলাক্ত ত্বক বিশিষ্ঠ পুরুষ, মহিলাদের চেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। মহিলাদের মাসিকের এক সপ্তাহ আগে ব্রণের আধিক্য দেখা যায়।

ব্রণ সাধারণত মুখ, ঘাড়, বুক ও পিঠে এবং থুতনিতে বেশী হয়।

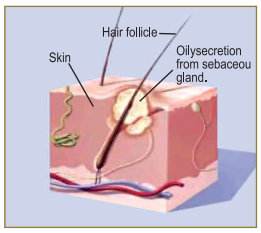

রোগের প্রক্রিয়া (Pathogenesis)

চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত ব্রণ হয়ে থাকে। সেগুলো হলো -

- প্রদাহ
- সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড (Sebaceous Gland) কর্তৃক অতিরিক্ত সিবাম উৎপন্ন হওয়া
- লোমকূপের (Follicle) বাহিরের আবরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
- ***Propionibacterium acnes*** নামক ব্যকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি

চিকিৎসা

সাধারন চিকিৎসা (General Treatment)

- কিছু কিছু ওষুধ যেমন স্টেরয়েড হরমোন, লিথিয়াম, সাইক্লোসপোরিন ব্রণের বিস্তৃতি বাড়িয়ে দেয়। ব্রণের চিকিৎসার সময় এ জাতীয় ওষুধগুলো ব্যবহার না করাই ভাল।
- অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাবার ব্রণ বাড়িয়ে দিতে পারে। কাজেই পরিমান মতো শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- মলম জাতীয় ওষুধ (Topical Medication) শুধুমাত্র আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার না করে সারা মুখমন্ডলে ব্যবহার করতে হবে।
- মুখে গ্রহণ জাতীয় ওষুধ এবং মলম জাতীয় ওষুধ একসাথে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা (Medical Treatment)

- ***মলম জাতীয় ওষুধ (Topical Treatment)***

  রেটিনয়েড (Topical Retinoid) : লোমকূপের (Hair Follicle) স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ফলে কমেডোনগুলো উৎপন্ন হতে পারে না এবং নতুন করে ব্রণ উৎপন্ন হয় না। পাশপাশি রেটিনয়েড জাতীয় ওষুধগুলো প্রদাহ (Inflammation) রোধে সহায়তা করে।

  মলম জাতীয় রেটিনয়েডগুলো হচ্ছে -

  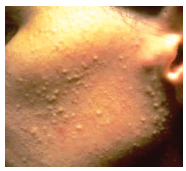

  - ট্রেটিনয়েন (Tretinoin)
  - এডাপালিন (Adapalene)
  - তাজারোটিন (Tazarotene)

- ***বেনজোইল পারওক্সাইড (Benzoyl Peroxide)***

  প্রোপায়োনিব্যাকটেরিয়াম একনি (*Propionibacterium acnes*) নামক একট ব্যাকটেরিয়া ব্রণের প্রদাহে সহায়তা করে। বেনজোইল পারঅক্সাইড-এ জাতীয় ব্যাকটেরিয়া রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

- ***এন্টিব্যাকটেরিয়াল (Antibacterials)***

  Topical Clindamycin এবং Topical Erythromycin জাতীয় ওষুধগুলো ব্রণের বাহ্যিক চিকিৎসায় খুবই কার্যকর। এ ওষুধগুলো Topical Retinoid এর সাথে যুগ্মভাবে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং antibiotic resistance এর সম্ভাবনা কমে যায় । এ ওষুধগুলো Pregnancy Category B জাতীয়। কাজেই গর্ভবতী মহিলারাও জরুরী অবস্থায় এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

- ***এজেলিক এসিড (Azelaic Acid)***

  এ ওষুধটি Pregnancy Category B এর অন্তর্ভুক্ত এবং ব্রণের প্রদাহে কার্যকর।

- ***মুখে গ্রহণ উপযোগী এন্টিবায়োটিক (Oral Antibiotic)***

  মাঝারী বা মারাত্মক ধরনের ব্রণে Oral Antibiotic নির্দেশিত। বহুল ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক গুলো হচ্ছে-

  - টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) : দাম কম ও নিরাপদ, ২৫০-৫০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ১-৪ বার দিতে হয়। খালি পেটে অধিক কার্যকর, গর্ভবতী মহিলাদের দেয়া যাবে না।
  - ডক্সিসাইক্লিন (Doxycycline) : ৫০-১০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ১ বার বা ২ বার দিতে হয়। খাবারের পর বা ভরা পেটে নির্দেশিত।
  - মিনোসাইক্লিন (Minocycline) : ব্রণে অধিক কার্যকর একটি ওষুধ, ৫০-১০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ১ বার বা ২ বার ব্যবহার্য।
  - ইরাইথ্রোমাইসিন (Erythromycin) : গর্ভবতী মহিলা যারা Tetracycline জাতীয় ওষুধ নিতে পারেন না তাদের জন্য Erythromycin উপযোগী। ২৫০-৫০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ২-৪ বার নির্দেশিত।
  - ক্লিনডামাইসিন (Clindamycin) ঃ ১৫০ মিঃ গ্রাঃ করে দিনে ৩ বার দেয়া যেতে পারে।

- ***মুখে গ্রহণ উপযোগী রেটিনয়েড (Oral Retinoid)***

  সাধারণ ব্রণে আইসোট্রেটিনয়েন (Isotretinoin) একটি কার্যকরী ওষুধ। ০.৫-১ মিঃ গ্রাঃ/কেজি দিনে ২-৩ বার ব্যবহার করা যেতে পারে, কোন অবস্থাতেই গর্ভবতী মহিলাদের দেয়া যাবে না কারণ ওষুধটি গর্ভের সন্তানের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

পেপটিক আলসার

পেপটিক আলসার একট অতি পরিচিত রোগ। এই রোগের বিস্তার পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে পেপটিক আলসারের প্রকোপ কমতে থাকলেও তৃতীয় বিশ্বে এটি এখনও অনেক বেশি পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও এই রোগটি খুব বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে। বর্তমানে এই দেশের প্রায় ৭% পূর্ণবয়স্ক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মাঝে এই রোগ বেশি পাওয়া যায়।

পেপটিক আলসার কী

আমাদের পরিপাকনালীর ভেতরের দেয়ালে 'মিউকাস ঝিল্লী' - নামক একটি স্তর থাকে। পাকস্থলী হতে অতিরিক্ত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ হলে অনেক সময় পরিপাকনালীর মিউকাস ঝিল্লীতে ক্ষত তৈরি হতে পারে। এই ক্ষত বা ঘা-কেই পেপটিক আলসার বলা হয়। পরিপাকনালীর বিভিন্ন অংশে আলসার হতে পারে। যেমন ঃ

- ডিওডেনামের আলসার (Duodenal Ulcer)
- পাকস্থলীর আলসার (Gastric Ulcer)
- অন্ননালীর নিম্নাংশের আলসার (Lower Esophageal Ulcer)
- মেকেল'স ডাইভারটিকুলামের আলসার (Mekel's Diverticulum Ulcer)
- পাকস্থলী-জেজুনামের সংযোগস্থলের আলসার (Ulcer at Gastro-jejunal Anastomosis)

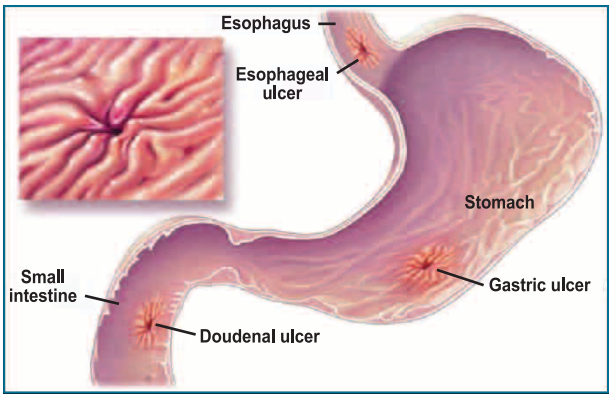

পেপটিক আলসার

এসব স্থানের মধ্যে ডিওডেনামে সবচেয়ে বেশি আলসার পাওয়া যায়। পাকস্থলীর আলসারের চেয়ে ডিওডেনামের আলসার প্রায় ৪ গুন বেশি হয়ে থাকে। পেপটিক আলসার সাধারণত একসাথে একটি হলেও ১০-১৫% ক্ষেত্রে একাধিক হতে পারে। এটি কখনও স্বল্পমেয়াদী, আবার কখনও দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। তবে নিয়মিত ওষুধ খেলে এবং কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চললে দীর্ঘমেয়াদী পেপটিক আলসার সম্পূর্ণ নিরাময় হতে পারে।

পেপটিক আলসার কেন হয়

অনেক কারণেই পেপটিক আলসার হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এসব কারণ সরাসরি পেপটিক আলসার-এর জন্য দায়ী। আবার কিছু কিছু কারণে পেপটিক আলসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। পেপটিক আলসার-এর জন্য দায়ী উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ নিম্নরূপ ঃ

❐ হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি *(H. pylori)*

হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি একটি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যা সরাসরি পেপটিক আলসার রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রায় ৯০% ডিওডেনাল আলসার এবং ৬০% পাকস্থলীর আলসার হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয়ে থাকে। এই জীবাণুটি খাবার ও পানির সাথে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং পাকস্থলীর দেয়ালের গভীরে অবস্থান নেয়। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ৯০% মানুষ এই ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলেও সবার ক্ষেত্রে আলসার হয়না। ***H. pylori*** পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এর নিঃসরন বাড়িয়ে দেয় যা ডিওডেনাম ও পাকস্থলীর মিউকাস ঝিল্লীতে ক্ষত তৈরি করে। তাই পেপটিক আলসার চিকিৎসার আসল কথা হচ্ছে পাকস্থলী হতে ব্যাকটেরিয়াটি নির্মূল করা (Eradication of ***H. pylori***).

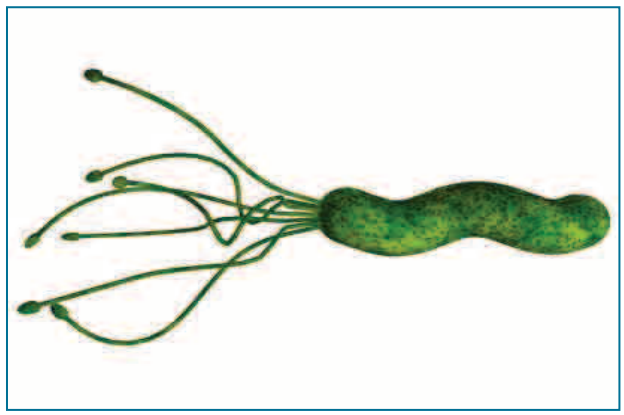

*হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি **(H. pylori)***

❐ ব্যথানাশক ওষুধ (NSAIDs)

NSAIDs-জাতীয় ব্যথানাশক ওষুধ যেমন এসপিরিন, ইন্ডোমিথাসিন, ডাইক্লোফেনাক, কেটোরোলাক, ন্যাপ্রোক্সেন, কিটোপ্রোফেন, ইটোরিকক্সিব, এসিক্লোফেনাক ইত্যাদি সরাসরি পেপটিক আলসারের জন্য দায়ী। এসব ওষুধ পাকস্থলী ও ডিওডেনামের এসিড প্রতিরোধী মিউসিন-নামক আবরণটি নষ্ট করতে পারে। ফলে, পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড সরাসরি পাকস্থলী ও ডিওডেনামের ভেতরে দেয়ালের সংস্পর্শে এসে সেখানে ক্ষত তৈরি করতে পারে। বয়স্ক রোগী যারা ব্যথার ওষুধ সেবন করেন তাদের ক্ষেত্রে আলসারের ঝুঁকি অধিক। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে মাত্র একবার এসব ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহারেই আলসার হতে পরে। ট্যাবলেট বা সাপোজিটরির চেয়ে ইনজেকশনের ক্ষেত্রে আলসার হওয়ার ঝুঁকি অধিক এবং জেলির ক্ষেত্রে ঝুঁকি সবচেয়ে কম।

❐ অন্যান্য ওষুধ

NSAIDs-ছাড়া অন্যান্য ওষুধ যেমন কর্টিকোস্টেরয়েড (হাইড্রোকর্টিসন, প্রেডনিসোলন, ডেক্সামেথাসন), পটাসিয়াম ক্লোরাইড, বিসফসফোনেট, ক্যান্সার কেমোথেরাপি ইত্যাদি ওষুধ মিউকাস ঝিল্লীকে ক্ষতিগ্রস্থ করে পেপটিক আলসার করতে পারে।

❒ **ধুমপান**

পেপটিক আলসার-এর অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে ধুমপান। ***H. pylori*** আক্রান্ত ব্যক্তি যদি ধুমপায়ী হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে পেপটিক আলসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তাছাড়া ধুমপায়ী ব্যক্তির আলসার নিরাময় হতে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়।

❒ **অ্যালকোহল বা মদ্য পান**

অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করলে পাকস্থলীর মিউকাস ঝিল্লী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অ্যালকোহল পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড-এর নিঃসরণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তাছাড়া ***H. pylori*** আক্রান্ত ব্যক্তি যদি অ্যালকোহল পান করে তাহলে তার ক্ষেত্রে ধুমপায়ীদের মতই পেপটিক আলসার হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

❒ **খাদ্যাভ্যাস**

বহুদিন আগে থেকে এই ধারনা প্রচলিত যে অতিরিক্ত তেল, ভাজা-পোড়া ও মসলাযুক্ত খাবার গ্রহণে পেপটিক আলসার হয়। তবে পেপটিক আলসারের সাথে মসলাযুক্ত খাবারের সম্পর্ক এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায়নি। মসলাযুক্ত খাবারের সাথে বুক-জ্বালা (GERD), অম্লাধিক্য ইত্যাদি অসুখের সম্পর্ক রয়েছে।

❒ **জটিল শারীরিক অবস্থা (Physical Stress)**

কিছু জটিল শারীরিক অবস্থা যেমন আশংকাজনকভাবে আগুনে পোড়া, সড়ক দূর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়া, মাথায় আঘাত পাওয়া, শক এবং লাইফ সাপোর্টে থাকা রোগীদের বেলায় পেপটিক আলসার হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যে আলসার হয় তার নাম "Stress Ulcer".

❒ **পাকস্থলীর টিউমার ও ক্যান্সার**

প্যাকস্থলীর বেশিরভাগ ক্যান্সার সাধারণত আলসার হিসেবে শুরু হয়। তবে ডিওডেনামে ক্যান্সারের জন্য আলসার হওয়ার ঘটনা অতি বিরল। পাকস্থলীতে "Gastrinoma" নামে এক ধরণের টিউমার হতে পার। এই রোগে পাকস্থলী হতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসরণ বেড়ে যায় (Zollinger-Ellison Syndrome)। এই অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড পকস্থলী ও ডিওডেনামে আলসার তৈরী করতে পারে।

পেপটিক আলসারের লক্ষণসমূহ কী কী

পেপটিক আলসার সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী রোগ যার তীব্রতা সময়ের সাথে হেরফের হয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা কিছুদিন ভাল থাকেন, আবার কোন কোন সময় রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে। পেপটিক আলসার-এর সাধারণ লক্ষণ সমূহ নিম্নরূপ হয়ে থাকে -

- এই রোগের প্রধান উপসর্গ হল পেট-ব্যথা। এই ব্যথা নাভী হতে শুরু হয়ে বুকের মাঝ পর্যন্ত যেকোন স্থানে হতে পারে। খাবারের সাথে এই ব্যথা সম্পর্কিত। পাকস্থলীর আলসার-এর বেলায় খাবার গ্রহণ করার সাথে সাথে ব্যথা বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ডিওডেনামের আলসার-এর ক্ষেত্রে খালি পেটে ব্যথা বেশি হয় যা এন্টাসিড বা খাবার গ্রহণ করার সাথে কমতে থাকে। খাবার গ্রহণ করার ৪-৫ ঘন্টা পর আবার ব্যথা শুরু হয়।
- বমি বমি ভাব হওয়া, কখনও কখনও বমিও হতে পারে।
- ক্ষুধামন্দা এবং ওজন হ্রাস পাওয়া।
- অতিরিক্ত ঢেকুর ওঠা।
- কিছু কিছু রোগীর বেলায় আলসার থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যথার অনুভূতি ঠিকমত বুঝতে পারেনা। তাদের কেউ কেউ রক্তশূন্যতা, হঠাৎ রক্তবমি বা পায়খানার সাথে কালো রক্ত যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারের শরনাপন্ন হতে পারে।
- অল্প কিছু রোগীর (৫%) বেলায় আলসার গভীর হতে হতে ডিওডেনাম ও পাকস্থলীর দেয়ালে ছিদ্র তৈরি করতে পারে। তারা সাধারণত হঠাৎ করে তীব্র পেট-ব্যথা, বমি ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়।

পেপটিক আলসার-এ পেট-ব্যথা

পেপটিক আলসার-এর ভীতিকর লক্ষণসমূহ কী কী

বুকজ্বালা এবং পেপটিক আলসার-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যথার সাথে অনেক সময় কিছু লক্ষণ থাকে যাদেরকে বলা হয় ভীতিকর লক্ষণ (Alarming features) যেমন ঃ

- ক্রমাগত ওজন কমে যাওয়া
- রক্তশূন্যতা
- রক্তবমি
- পায়খানার সাথে কাল রক্ত যাওয়া
- খাবার খেতে সমস্যা হওয়া বা খাওয়ার সাথে সাথে বমি আসা
- পেটের উপরিভাগে চাকা বা গুটির মত ফুলে যাওয়া

এসব লক্ষণ কোন বয়স্ক (৫৫ বছর বা ততোধিক) রোগীর মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে জরুরীভিত্তিতে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

পেপটিক আলসার-জনিত জটিলতা কী কী

প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ পেপটিক আলসার-এর রোগী বিভিন্ন মারাত্মক জটিলতায় আক্রান্ত হয়। সাধারণত বৃদ্ধ রোগী এবং যারা দীর্ঘদিন NSAIDs- জাতীয় ব্যথানাশক ট্যাবলেট সেবন করেন তারা এসব জটিলতায় অধিকহারে আক্রান্ত হয়। এসব জটিলতাগুলো নিম্নরূপ ঃ

❐ **ডিওডেনাম বা পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ**

পেপটিক আলসার-এর রোগী এই জটিলতায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় (১৫-২০%)। হঠাৎ তীব্র পেটে ব্যথার সাথে রক্তবমি হতে পারে। অনেক সময় রক্তবমি না হয়ে পায়খানার সাথে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হয়। এসব ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হয়। অধিকাংশ সময় রোগীকে রক্ত দিতে হয়। ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসায় (ওমেপ্রাজল, ট্রানেক্সামিক এসিড) রক্তবমি বন্ধ না হলে এন্ডোসকোপির মাধ্যমে ক্লিপিং করে রক্ত বন্ধ করতে হয়।

❐ **ডিওডেনাম বা পাকস্থলীতে ছিদ্র তৈরি হওয়া**

২-১০% পেপটিক আলসার-এর রোগীর ক্ষেত্রে ডিওডেনাম বা পাকস্থলীতে ছিদ্র তৈরি হতে পারে। ছিদ্র হওয়ার ফলে ডিওডেনাম বা পাকস্থলীর খাবার পেটের অভ্যন্তরীণ গহবরে চলে যায় এবং পেরিটোনাইটিস নামক জীবন-ঘাতী সমস্যা তৈরি করতে পারে। হঠাৎ তীব্র পেট-ব্যথা, বমি এবং জ্বর এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। এই রোগের ক্ষেত্রেও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে। সার্জারি করে ছিদ্র বন্ধ না করলে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।

❐ **ডিওডেনাম বা পাকস্থলীর নালী বন্ধ হয়ে যাওয়া**

৫-৮% পেপটিক আলসার-এর রোগীর ক্ষেত্রে ক্ষত শুকানোর সময় ডিওডেনাম বা পাকস্থলীর নালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। খাওয়ার সাথে সাথে বমি হওয়া, দিনে দিনে ওজন কমে যাওয়া, অতিরিক্ত দুর্বলতা এই রোগের লক্ষণ। এই রোগের ক্ষেত্রেও হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এন্ডোসকোপির সাহায্যে অনেক সময় আংশিক বন্ধ হয়ে যাওয়া নালী খুলে দেয়া যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্জারির প্রয়োজন হয়।

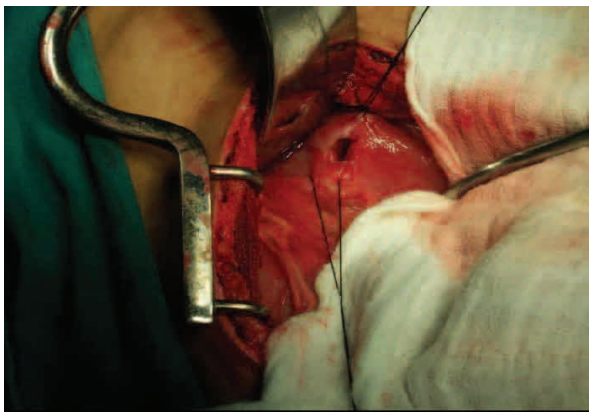

ডিওডেনামে ছিদ্র

❐ **পাকস্থলীতে ক্যান্সার তৈরি হওয়া**

১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা ঘোষণা দেয় যে ***H. pylori*** ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। সারা পৃথিবীব্যাপী বছরে প্রায় ৭ লাখ পাকস্থলীর ক্যান্সারের রোগী পাওয়া যায় যার অধিকাংশই ঘটে ***H. pylori*** সংক্রমণের জন্য। পাকস্থলীতে ***H. pylori*** সংক্রমণ হলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৬ গুণ বেড়ে যায়। চিকিৎসার সাহায্যে ***H. pylori*** নির্মূল করা হলে পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।

পেপটিক আলসার রোগ কিভাবে নির্ণয় করা হয়

সাধারণত রোগের লক্ষণগুলো বিবেচনায় নিয়ে পেপটিক আলসার সম্পর্কে সন্দেহ করা হয় এবং এর ভিত্তিতেই ডাক্তারগণ চিকিৎসা দিয়ে থাকে। চিকিৎসায় প্রায় সবাই সুস্থ হয়ে যায়। তবে আলসার এবং ***H. pylori*** এর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হয়। তাছাড়া চিকিৎসার পর আবার লক্ষণসমূহ ফিরে আসলে বা কোন জটিলতা দেখা দিলে বা ভীতিকর লক্ষণসমূহ পাওয়া গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যেমন-

❐ **এন্ডোসকোপি**

ডিওডেনাম, পাকস্থলী বা অন্ননালীতে আলসার-এর উপস্থিতি নির্ণয় করতে এন্ডোসকোপি করা হয়। এর মাধ্যমে আলসার-এর অবস্থান, সংখ্যা, গভীরতা বুঝা যায়। কোন ধরণের বায়োপসি নিতে হলেও এন্ডোসকোপির প্রয়োজন হয়। পরবর্তীতে এই বায়োপসি পরীক্ষা করে ক্যান্সারের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া আলসার হতে রক্তপাত হয়ে রক্তবমি হলে তা বন্ধ করতে বা পাকস্থলীর নালী সরু হয়ে গেলে তা প্রশস্ত করতে এন্ডোসকোপি অতীব প্রয়োজনীয়।

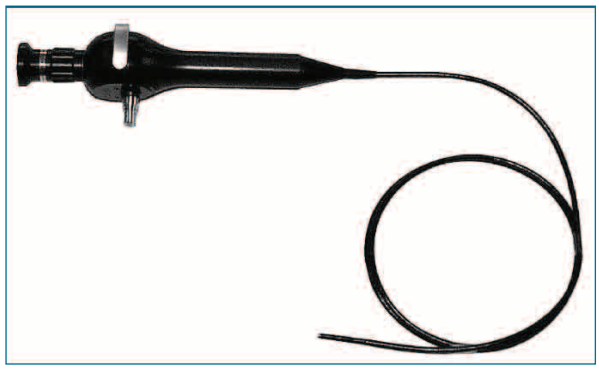

এন্ডোসকোপ

❐ ***H. pylori* -এর উপস্থিতি নির্ণয়**

এন্ডোসকোপির মাধ্যমে পাকস্থলী হতে বায়োপসি নিয়ে তা কালচার করে ***H. pylori*** -এর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। তাছাড়া রক্তে এন্টিবডি ও নিঃশ্বাসে তেজস্ক্রিয় কার্বনযুক্ত ইউরিয়ার উপস্থিতির সাহায্যেও ***H. pylori*** -এর উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

❐ **রক্ত পরীক্ষা**

অনেক পেপটিক আলসার-এর রোগীর ক্ষত থেকে অল্প পরিমাণ রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় সবসময় ঝরতে থাকে। এভাবে অনেকদিন রক্ত ঝরতে থাকলে রোগী আয়রন ও রক্তশূন্যতায় ভোগে। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তশূন্যতার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

❐ **বেরিয়াম এক্স-রে**

যেসব রোগীর খাবার গ্রহণের সাথে সাথে বমি শুরু হয় তাদের জন্য এন্ডোসকোপির পাশাপাশি বেরিয়াম এক্স-রে করা হয়। বেরিয়াম মিশ্রিত খাবার খাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর পেটের এক্স-রে করা হয়। পাকস্থলী ও ডিওডেনামের নালী সরু হয়ে গেলে বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে তা বেরিয়াম এক্স-রে পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

❐ **পেটের এক্স-রে**

পাকস্থলী বা ডিওডেনামের দেয়াল ছিদ্র হয়ে গেলে পেটের অভ্যন্তরস্থ গহবরে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। পেটের এক্স-রে করে এই গ্যাসের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

পেপটিক আলসার কিভাবে চিকিৎসা করা হয়

পেপটিক আলসার-এর চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল লক্ষণসমূহ উপশম করা, *H. pylori* নির্মূল করা, নতুন আলসার হওয়া এবং আলসার-জনিত জটিলতা প্রতিরোধ করা এবং জটিলতা হলে তার চিকিৎসা করা।

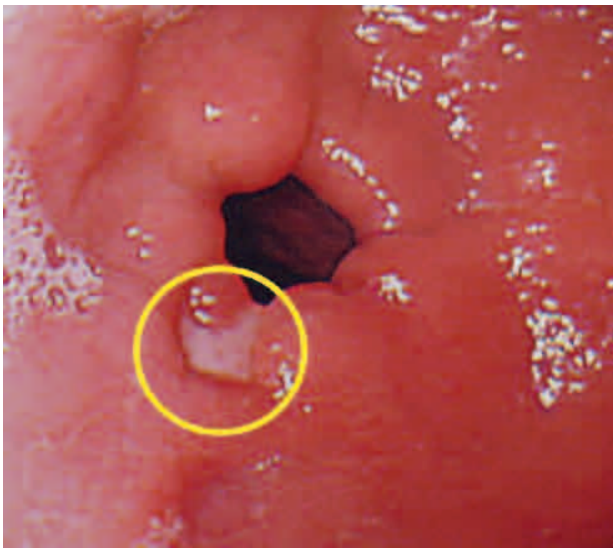

পেপটিক আলসার

❐ **স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা**

সাধারণত পেপটিক আলসার-এর উপসর্গসমূহ দ্রুত উপশম করার জন্য কিছু স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা দেয়া হয়। যেমন-

- বিভিন্ন ধরণের অম্লনাশক বড়ি ও সাসপেনশন
- প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (ওমেপ্রাজল, ইসোমেপ্রাজল, পেনটোপ্রাজল, ল্যানসোপ্রাজল, র‍্যাবেপ্রাজল) বা এইচ-২ রিসিপ্টর ব্লকার (রেনিটিডিন, ফ্যামোটিডিন)
- এন্টি-স্পাজমোটিক (টাইমোনিয়াম, হাইওসিন, ড্রোটাভেরিন)
- এন্টি-ইমেটিক (ওনডেনসেট্রন, ডমপেরিডন)

রোগী অতিরিক্ত বমি করতে থাকলে অম্লনাশক ছাড়া বাকি ওষুধগুলো ইনজেকশনের মাধ্যমে দেয়া উচিত। এগুলো ছাড়াও অনেক সময় সুক্রালফেট ট্যাবলেটও ব্যবহার করা হয়।

❐ ***H. pylori* নির্মূল করা**

বেশিরভাগ পেপটিক আলসার-এর রোগীকে ***H. pylori*** নির্মূল করার জন্য ওষুধ দেয়া উচিত। কারণ এই জীবাণুটি নির্মূল করতে না পারলে বার বার আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আলসার যত দীর্ঘমেয়াদী হয়, সেখানে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি থাকে। তাই, ***H. pylori*** নির্মূল করার জন্য ওষুধ দেয়া হলে তা একই সাথে পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকিও অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

***H. pylori* নির্মূল করার জন্য সমন্বিত ওষুধ**

- যেকোন একটি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিনে দুইবার (এক্ষেত্রে এইচ-২ রিসিপ্টর ব্লকার ব্যবহার করা যাবেনা)
- ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার
- এমোক্সিসিলিন ১ গ্রাম বা মেট্রোনিডাজল ৪০০ মি.গ্রা. দিনে দুই বার।

এই তিনটি ওষুধ বর্তমানে একসাথে একই পাতায় পাওয়া যায়। প্রতিদিন সকালে একপাতা এবং রাতে এক পাতা করে মোট ১০-১৪ দিন একটানা খেতে হয়। এরপর টানা দুই মাস যেকোন একটি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিনে দুইবেলা খেতে হয়। ঠিকভাবে ওষুধগুলো খেলে পেপটিক আলসার হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❐ **দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা**

স্বল্পমেয়াদী চিকিৎসা বা ***H. pylori*** নির্মূল করার জন্য সমন্বিত ওষুধ শেষ হলে কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে (৬ মাস) প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর বা এইচ-২ রিসিপ্টর ব্লকার ব্যবহার করতে হয়। এসব ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলেও তেমন জটিলতা এখনো পাওয়া যায়নি।

❐ **সার্জারি বা শল্যচিকিৎসা**

সাধারণত পেপটিক আলসার-জনিত জটিলতার ক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। পাকস্থলী বা ডিওডেনামের নালী বন্ধ হয়ে গেলে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ কেটে বাদ দিয়ে বাকি অংশ জেজুনামের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। ডিওডেনাম বা পাকস্থলীতে ছিদ্র তৈরি হলে তা বন্ধ করতেও সার্জারির প্রয়োজন হয়। দক্ষ শল্যবিদের হাতে এই সার্জারিগুলো তেমন ঝুঁকিপূর্ণ না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন পরবর্তী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

পেপটিক আলসার প্রতিরোধে কী কী করনীয়

- ধুমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে।
- অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবার পরিহার করে তাজা শাক-সবজি ও ভিটামিনযুক্ত ফল খেতে হবে।
- দীর্ঘদিন NSAIDs -জাতীয় ব্যথানাশক ওষুধ বা কর্টিকোস্টেরয়েড খাওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে প্যারাসিটামল বা অন্যান্য ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। NSAIDs বা কর্টিকোস্টেরয়েড-এর সাথে একটি প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর খেতে হবে; এখানে এইচ-২ রিসিপ্টর ব্লকার ব্যবহার করা উচিত নয়।
- খাবারের পূর্বে ও শৌচকাজের পরে ভালমত হাত ধৌত করলে এবং আলাদা তৈজসপত্র ব্যবহার করলে ***H. pylori*** সংক্রমন প্রতিরোধ করা যায়।

তথ্যসূত্র

❐ স্কয়ার

মেনোপজ

মেনোপজ (Menopause) কোন রোগ নয়, এটি একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া। এটি হরমোনের প্রভাব এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। মেনোপজ মানেই যৌবনের শেষ নয়। যদিও একটা সময় খুব অল্প মহিলারা মেনোপজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতো, কিন্তু আজকাল অধিকাংশ মহিলা জীবনের বড় একটা অংশ কাটায় মেনোপজের পর।

নারীদের মাসিক শুরু হয় বয়ঃসন্ধিকালে। এরপর এই মাসিক নিয়মিতভাবে চলতে থাকে অনেক বছর। তারপর এক পর্যায়ে এই মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। স্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হওয়াকে বলা হয় মেনোপজ। এই মেনোপজ প্রত্যেক মহিলার জীবনেই আসে। কারো আগে, কারো পরে।

আমাদের দেশে মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজ হয় ৪৫ থেকে ৫২ বছর বয়সের মধ্যে। কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজ হয় ৪০ বছর বয়সে এবং কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজ হয় ৬০ বছর বয়সে।

মেনোপজের ঝুঁকিসমূহ

কিছু কিছু বিষয় অনেক ক্ষেত্রে রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এগুলোকে বলা হয় রিস্ক ফ্যাক্টর। মেনোপজ একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা সাধারণত ৫০ বছর বয়সের আশে পাশে হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৪০ বছরের মধ্যেই কারো কারো মেনোপজ হতে পারে তাকে বলা হয় প্রিমেচিয়ুর (Premature) বা অকাল মেনোপজ।

অকাল মেনোপজ হওয়ার ঝুঁকিসমূহ -

১. পারিবারিক ইতিহাস

২. সার্জারির মাধ্যমে ডিম্বাশয় অপসারণ

৩. তেজস্ক্রিয় বিকিরন (রেডিওথেরাপি)

৪. কেমোথেরাপি

৫. ধুমপান

৬. ওষুধ (এন্টিইস্ট্রোজেনিক)

মেনোপজের কারণ সমূহ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মহিলাদের ডিম্বাশয় কার্যকারিতা হারাতে থাকে। ফলে ডিম্বাশয় হতে হরমোন তৈরি হওয়ার পরিমাণ কমে যায়। ধীরে ধীরে ডিম্বাশয়ের কার্যকারিতা কমতে কমতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন ডিম্বাশয় ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন একেবারেই তৈরি করতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে মেনোপজ নামক শারীরিক অবস্থার উৎপত্তি হয়। এ সময় মাসিক ঋতুচক্র একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু মেনোপজ হওয়ার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ এবং কয়েক বছরে সম্পন্ন হয়, তাই এটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. পেরিমেনোপজঃ- এ সময় ডিম্বাশয়ে হরমোন তৈরির পরিমাণের তারতম্য ঘটে। ফলে অনেকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। যদিও অনিয়মিত ঋতুচক্র এ সময়ের প্রধান উপসর্গ। প্রায় চার/পাঁচ বছর এ অবস্থা চলতে পারে।

খ. পোস্টমেনোপজঃ- যদি পেরিমেনোপজ অবস্থায় একটানা ছয় মাস (কারো কারো মতে বারো মাস) ঋতুচক্র বন্ধ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে মেনোপজ শুরু হয়ে গেছে। এই শারীরিক অবস্থার নাম হচ্ছে পোস্টমেনোপজ। এই সময় ডিম্বাশয় হতে ডিম্ব নিঃস্বরণ হয়না এবং হরমোন তৈরির পরিমাণও অতি নগন্য।

উপসর্গ

মেনোপজ হলে দেখা দেয় নানা শারীরিক ও মানসিক উপসর্গ। এসব উপসর্গ কমবেশী সব নারীর মধ্যেই হতে পারে। শারীরিক লক্ষণগুলোর মধ্যে ঋতুস্রাব বন্ধই প্রধান। বন্ধ হওয়ার আগে কয়েক মাস প্রতিবার কম পরিমাণে ঋতুস্রাব হয় কিংবা দেরিতে বা অনিয়মিত সময়ে হতে পারে। আবার কখনো এসব পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মেনোপজের আগে মহিলাদের নানা ধরনের অস্বাভাবিক অনুভূতি হতে পারে। যেমন-

- শরীরের কোন কোন জায়গায় হঠাৎ গরম অনুভত হওয়া (Hot Flush)
- অতিরিক্ত ঘাম
- অনিদ্রা
- কোষ্ঠকাঠিন্য
- দুর্বলতা
- রক্তচাপ বৃদ্ধি
- বুক ধরফড় করা
- মেদবৃদ্ধি
- ওজন বৃদ্ধি

এ ধরনের উপসর্গ মেনোপজের সময়ে অনেক মহিলারই হয়ে থাকে। এ সময়ে ত্বকের কমনীয়তাও লোপ পেতে পারে। তাছাড়া মানসিক লক্ষণগুলোর মধ্যে-ভীতি ও হতাশাবোধ ইত্যাদি থাকতে পারে।

মেনোপজ কিভাবে নির্ণয় করবেন

মেনোপজ শুরু হল কিনা তা বোঝার জন্য ডাক্তারগণ উপসর্গ, লক্ষণ, পারিবারিক ইতিহাস, অন্যান্য রোগের ইতিহাস বিবেচনা করেন এবং কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করার উপদেশ দেন। যদি কোন মহিলার পর পর ৬ মাস মাসিক ঋতুচক্র বন্ধ থাকে এবং তার বয়স যদি ৫০ বছরের আশে পাশে হয় তখন ধরে নেয়া হয় যে তার মেনোপজ শুরু হয়েছে। অনেক সময় ডাক্তারগণ রক্তের হরমোনের মাত্রা দেখে মেনোপজ নির্ণয় করে থাকেন। যেমন- ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH)। রক্তে এই হরমোনের মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে মেনোপজের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

চিকিৎসা

মেনোপজ একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। তবে এর বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ উপশম করার জন্য এবং মেনোপজের সাথে সম্পর্কিত শারীরিক জটিলতা নিরসনের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

মেনোপজের চিকিৎসা শুরুর আগে আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন- হৃদরোগ, হাড়ের ক্ষয়রোগ, স্তনক্যান্সার এবং এসব রোগের পারিবারিক ইতিহাস। চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেনোপজের অনাকাঙ্খিত লক্ষণসমূহ উপশম করা এবং মেনোপজের পরবর্তী সময়ে যেসব স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হতে পারে যেমন- হৃদরোগ, হাড়ের ক্ষয়রোগ, স্ট্রোক সেগুলো প্রতিরোধ করা।

চিকিৎসা সমূহ -

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT)

মেনোপজ পর্যায়ে পৌছানো অনেক মহিলাকে এই চিকিৎসা দেয়া যায়। এই চিকিৎসার কিছু ঝুঁকিও আছে। তাই অনেক কিছু বিবেচনা করে এই চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন। যেসব মহিলার স্তনক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগের ইতিহাস বা পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে হরমোন থেরাপি দেয়া যাবে না। অন্যদের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদে উপসর্গ নিরসনের জন্য হরমোন থেরাপি দেয়া যেতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে হরমোন থেরাপি দেয়া যাবে-

ক. হটফ্লাশ ঃ মেনোপজের সাথে জড়িত হটফ্লাশ এবং অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার সমস্যা নিরসনে হরমোন থেরাপি সবচেয়ে উপকারী। এ ক্ষেত্রে প্রিগাবালিন ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

খ. যোনিপথের অস্বস্তি ঃ মেনোপজ পরবর্তী যোনিপথে শুষ্কতা, অস্বস্তিকর ভাব ইত্যাদি দূর করতে হরমোন থেরাপি উপকারী।

গ. হাড়ের ক্ষয়রোগ ঃ হাড়ের ক্ষয়রোগ প্রতিরোধে হরমোন থেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এটি সাধারণত অন্যান্য চিকিৎসা ব্যর্থ না হলে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

শারীরিক জটিলতা

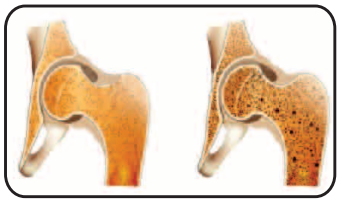

মেনোপজ শুরু হলে কিছু দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিছুটা সাবধান হলেই এসব জটিলতার ঝুঁকি অনেক কমানো যায়।

ক. হৃদরোগ ঃ ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কমার সাথে সাথে বিভিন্ন হৃদরোগ দেখা দিতে পারে।

খ. হাড়ের ক্ষয়রোগ ঃ মেনোপজ পরবর্তী সময়ে ইস্ট্রোজেন হরমোন কমে যাওয়ার কারণে হাড়ের সঞ্চিত ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। হাড়ের এই অবস্থাকে অস্টিওপরোসিস বলা হয়। এর ফলে হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। এ সময়ে কোমড়, হিপবোন, কব্জি এবং মেরুদন্ডের ভাঙ্গন জনিত সমস্যায় অনেক মহিলা ভোগে থাকেন।

গ. ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স ঃ ইস্ট্রোজেনের অভাবে মূত্রনালী ও যোনি পথের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। ফলে অনেকেই ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ অনুভব করেন। অনেকের আবার হাঁচি, কাঁশি ও ভারী বস্তু উঠানামা করার সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণহীন মূত্র নির্গত হতে পারে।

ঘ. দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ঃ মেনোপজের পর কোন কোন মহিলার ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে। তাদের উচিত নিজেদের দৈহিক ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।

প্রতিরোধ

মেনোপজ কোনভাবেই প্রতিরোধ করা যায় না। তবে মেনোপজ পরবর্তী স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধ ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ-

- খাদ্যাভ্যাস- যে সকল খাদ্যে ফাইটাইস্ট্রোজেন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যেমন- সয়াবিন, মটরদানা, সিম, শস্যদানা এবং তাজা ফলমূল সেগুলো বেশি করে খেতে হবে।
- চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যাবে।
- প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম খেলে হাড়ের ক্ষয় এর ঝুঁকি কমে যায়। তাই অধিক হারে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন- সবুজ শাকসব্জি, দুধ, দই, ছোট মাছ ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে।
- ধুমপান পরিহার করতে হবে। এতে অকাল মেনোপজ, হৃদরোগ, হাড়ের ক্ষয় ইত্যাদির ঝুঁকি কমে।
- এলকোহল ও অতিরিক্ত চা কফি খাওয়া কমাতে হবে।
- শরীরচর্চা- নিয়মিত শরীরচর্চা করলে ভাল ঘুম হয়। মস্তিষ্কের কাজে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। দুশ্চিন্তা এবং মানসিক অবসাদ দুর হয়। হাটা, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি ভাল ব্যায়াম।
- মানসিক চাপ কমানো- নিয়মিত শরীরচর্চা, উত্তম খাদ্যাভ্যাস, পরিবারের সবার সাথে কাজ ভাগ করে নেয়া, বিনোদনমুলক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো যায়।

উপসংহার

মেনোপজ যে কোন নারীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি নারীর সামাজিক জীবন, আবেগ অনুভূতি এবং দৈনন্দিন কাজ কর্মে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে মেনোপজকে বিভিন্নভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হলেও এখন জানা গেছে এটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। তাই মেনোপজ পরবর্তী জীবনকে উপভোগ করাও একটি নতুন চ্যালেঞ্জ।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

পিত্তথলির পাথর

পিত্তথলিতে পাথর হওয়া আমাদের চারপাশের অতিপরিচিত রোগগুলোর মধ্যে একটি। আত্মীয়স্বজনের কারো পিত্তথলিতে পাথর হয়নি বা এজন্য গলব্লাডার ফেলে দিতে হয়নি এমন লোক মনে হয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সত্যিই কি পাথর না এগুলো অন্য কিছু! এসব কি সত্যিকারের পাথরের মত, কিভাবে ওখানে গেল এ জাতীয় নানা প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুরপাক খায়।

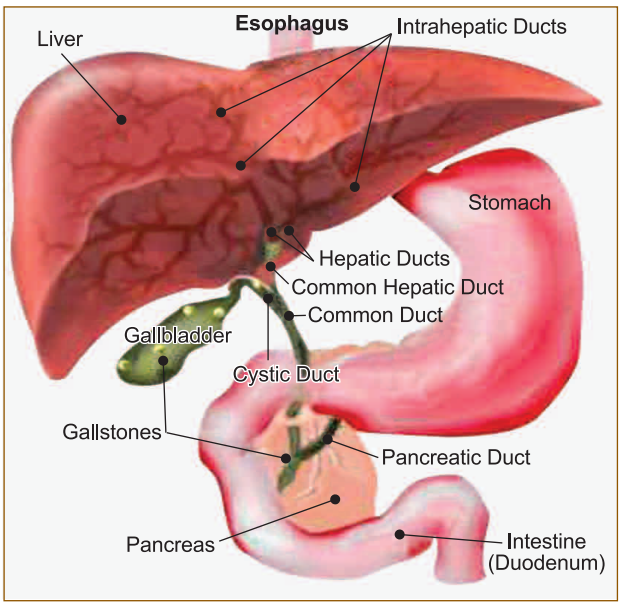

হ্যাঁ সত্যিই পিত্তথলিতে পাথর হয়। কোলেস্টেরল, ক্যালসিয়াম, বিলিরুবিন ইত্যাদির সংমিশ্রনে যে পাথরগুলো পিত্তথলিতে হয় তা দেখতে অনেকটাই রাস্তার পাথরের মতো। এদের কোনটি ময়লা সাদা, কোনটি হালকা বাদামী আবার কোনটি একদম কুচকুচে কালোবর্ণের হয়। পিত্তথলির পাথরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হয় কোলেস্টেরল পিত্তপাথর, কালো রঙের পিত্তপাথর এবং বাদামী রঙের পিত্তপাথর। অন্যদিকে পিত্তথলিতে সংক্রমণের জন্য বাদামী রঙের পিত্তপাথর হতে পারে।

পিত্তথলির অবস্থান ও এর কাজ কী

লিভার বা যকৃতের ঠিক নীচে পেটের ডানে উপরের দিকে পিত্তথলির অবস্থান। পিত্তথলি আকারে ছোট থলির মতো। যকৃত থেকে নিঃসৃত পিত্তরস পিত্তথলিতে এসে জমা হয়।

শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী এখান থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে কাজ করে। যখন আমরা চর্বি ও কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার খাই তখন পিত্তথলিতে জমে থাকা পিত্তরস সাধারণ পিত্তনালী (Common Bile Duct) দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে পৌঁছায় এবং খাবার হজমে সাহায্য করে। পিত্তরস আসলে এক ধরনের হলদেটে তরল পদার্থ। এর মূল উপাদান কোলেস্টেরল, লেসিথিন, ক্যালসিয়াম, পিত্ত লবণ, এসিড ও কিছু বর্জ্য পদার্থ। এসব উপাদানের তারতম্য হলেই পিত্তথলিতে পাথর তৈরি হয়। পিত্তথলি শুধু পিত্তরসকে কিছু সময়ের জন্য ধরে রাখে। পিত্তরস তৈরি হয় লিভারে। পিত্তথলি না থাকলে মানুষের কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ এ ক্ষেত্রে লিভার থেকে পিত্তরস সরাসরি পিত্তনালির মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

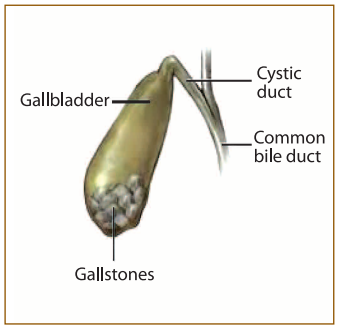

পিত্তথলিতে পাথর কেন হয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাকে বলে কলিলিথিয়াসিস (Cholelithiasis) বা গলস্টোন। উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকায় মোট জনগোষ্ঠীর ১০ থেকে ২০ শতাংশই এই রোগে ভোগে। আফ্রিকার জনগণের মধ্যে পিত্তথলির পাথরে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বিরল। পিত্তথলির পাথরে বেশি ভোগে উত্তর আমেরিকার মানুষ। এশীয়দের মধ্যেও পিত্তথলির পাথরে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিত্তথলির পাথরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে মহিলাদের দ্বিগুণ।

বেশির ভাগ পিত্তথলির পাথর গঠিত হয় কোলেস্টেরল এবং কিছু পিত্তরঞ্জক (Bile Pigment) নিয়ে। পিত্তথলির পাথরের প্রধান উপাদান হল কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরল ছাড়াও অন্যান্য উপাদান যেমন- ক্যালসিয়াম বিলিরুবিনেট, ফসফেট প্রভৃতি পিত্তরসে দ্রবীভূত থাকে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান যেমন- ফসফোলিপিড ও পিত্তলবণ পিত্তথলির ভেতর কোলেস্টেরলকে দ্রবীভূত রাখে। যদি কোনো প্রকার কোলেস্টেরল এবং এসব রাসায়নিক উপাদানের অনুপাত পরিবর্তন হয় তাহলে কোলেস্টেরল কম দ্রবীভূত হয় এবং স্তূপীকৃত হতে থাকে। এভাবে কোলেস্টেরল জমা হয়ে পিত্তপাথর তৈরি করে। রঞ্জক পদার্থের সৃষ্টি প্রণালী সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায়নি। তবে পিত্তনালীতে সংক্রমণ হলে এ ধরনের পাথর সৃষ্টি হয়। কালো পাথরগুলো গঠিত হয় ক্যালসিয়াম বিলিরুবিনেট, মিউসিন গ্লাইকোপ্রোটিন, ক্যালসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি দিয়ে।

পিত্তথলিতে পাথর কাদের বেশী হয়

চিকিৎসা শাস্ত্রে ৫টি এফ (5F) দ্বারা পিত্তথলির পাথর হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। 5F হলো- Female, Fair, Forty, Fertile & Flatulent। এর অর্থ হলো- মহিলা, সুন্দরী, ৪০ বছর বয়স, সন্তান ধারণে সক্ষম এবং পায়ুপথে অতিমাত্রায় গ্যাস নির্গত হয় এমন মানুষের পিত্তথলির পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ইহা সর্বক্ষেত্রেই সঠিক নয়, কারণ অনেক কম বয়সেও পিত্তথলির পাথর হতে পারে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশী।

পিত্তথলির পাথর

সাধারণত চল্লিশ বা চল্লিশোর্ধ, একটু ভারী চেহারার মহিলাদের এই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। থ্যালাসেমিয়া বা রক্তের অন্যান্য অসুখ থাকলে পিত্তথলিতে জমা পিত্তরসের উপাদানগুলোর তারতম্য হয় বলে পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার প্রবণতাও বেশী। এ ছাড়া ডায়াবেটিসের রোগী, লিভারের অসুখের রোগী, বার বার গর্ভবতী হলে পাথর হওয়ার আশঙ্কা বেশী থাকে।

পিত্তথলির পাথর হওয়ার ঝুঁকি কার

রক্তে কোলেস্টেরল বেশী থাকলেই পিত্তথলির পাথর হয় না। আবার কোন নির্দিষ্ট খাবার বেশী খেলে এটা হয় সেটাও ঠিক নয়। পিত্তথলির পাথর হওয়ার ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ-

- **বয়স-** বয়স বাড়তে থাকলে পিত্তথলির পাথরের ঝুঁকি বাড়ে।
- **লিঙ্গ-** পুরুষের তুলনার মেয়েদের পিত্তথলির পাথর বেশি হয়।
- **স্থূলতা-** মোটা মানুষের পিত্তথলির পাথর হবার সম্ভাবনা পাতলা মানুষের থেকে বেশি।
- **গর্ভাবস্থায়-** গর্ভাবস্থায় পিত্তরসে কোলেস্টেরল বেশি থাকায় পিত্তথলির পাথর হবার ঝুঁকি বেশি।
- **জন্মনিরোধক বড়ি বা হরমোন থেরাপি-** পিত্তথলির পাথর হবার সম্ভাবনা বাড়ায়।
- **দ্রুত ওজন কমা-** দ্রুত ওজন কমে যেতে থাকলে পিত্তথলির পাথর হতে পারে।
- **Crohn's Disease-** ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্রোনস ডিজিজ হলে পিত্তথলির পাথর হবার সম্ভাবনা থাকে।
- **রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড-এর মাত্রা-** উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড মাত্রার ব্যক্তির পিত্তথলির পাথর হতে পারে।

লক্ষণ

৮০ শতাংশ রোগীর কোন লক্ষণ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে চর্বিজাতীয় খাবার খেলে রোগীর অস্বস্তি লাগতে পারে। পিত্তথলিতে পাথর হলে এতে প্রদাহ-কলিসিস্টাইটিস (Cholecystitis) হয়। তখন পেটের উপরের দিকে ডান পাশে তীব্র ব্যথা হয়। যাকে অনেকে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যথা বলে থাকেন। এটা সাধারনত মিনিট খানেক স্থায়ী হয় তবে তা ঘন্টা খানেকও থাকতে পারে। ব্যথাটি পেটের পিছনের দিকে, কাঁধে, পেটের মাঝ বরাবর এবং বুকের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই সাথে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, জ্বর এই সব উপসর্গও থাকতে পারে। জন্ডিসও হতে পারে (অন্য অনেক কারণেও জন্ডিস হয়)।

উপসর্গ

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ রোগে কোন উপসর্গ পাওয়া যায় না। এদেরকে সাইলেন্ট রোগী বলে। সাধারণ উপসর্গগুলো নিম্নরূপ-

- ডিসপেপসিয়া (Dyspepsia) অর্থাৎ পেট ফেঁপে যাওয়া ও অস্বস্থি বোধ করা, বিশেষ করে খাবার খাওয়ার পর।
- চর্বি জাতীয় খাবার খেলে অসহ্য লাগা।
- ঢেকুর তোলা।
- ফ্লাটুলেন্স (Flatulance) পায়ুপথে অতিমাত্রায় গ্যাস নির্গত হওয়া।

তবে একিউট বা তীব্র উপসর্গ হল-

- একটানা পেটে ব্যথা, যা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।
- ১৫ মিনিট থেকে ৪-৫ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।
- নড়াচড়া করলে ব্যথা বাড়ে এবং সাথে সাথে বমি বমি ভাব হয় বা বমি হয়।
- ব্যথার তীব্রতা ডান পাশে বুকের খাচার নীচে থাকে।
- ব্যথা কখনও কখনও ডান কাঁধে অনুভূত হয়।
- ব্যথা কমে যাওয়ার কিছুদিন পর আবার হতে পারে।

পাথর থাকলে কী অসুবিধা হতে পারে

- সারা জীবন কোনো অসুবিধা নাও হতে পারে।

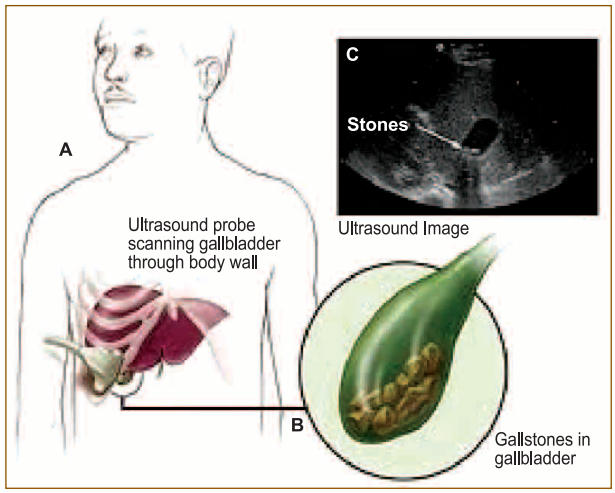

- পিত্তথলির ইনফ্লামেশন তথা Cholecystitis -এর জন্য যেকোনো সময় পেটের ডান দিকে প্রচন্ড ব্যথাসহ জ্বর আসতে পারে এবং বমিও হতে পারে।
- অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস বা সার্জিক্যাল জন্ডিস - পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে যা চর্বি জাতীয় খাবার খেলে পিত্তথলি থেকে বেরিয়ে 'কমন বাইল ডাক্ট' এর মাধ্যমে খাদ্যনালীতে চলে আসে। অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস এর ক্ষেত্রে এই কমন বাইল ডাক্ট-এ পাথর এসে জমা হয়, তখন বাইল শরীর থেকে বের না হতে পেরে জন্ডিস সৃষ্টি করে। এই জন্ডিসে সাধারণত বিলিরুবিন এর পরিমাণ অন্যান্য জন্ডিস এর থেকে বেশী হয়।
- প্যানক্রিয়াটাইটিস তথা অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ - পিত্তথলির পাথর কমন বাইল ডাক্ট থেকে নেমে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট এ আটকে গিয়ে একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস বা অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে, এর সাথে পেটের মাঝ দিকে তীব্র ব্যথা ও প্রচুর বমি হতে পারে। এই ব্যথা পেটে হওয়ার সাথে সাথে পিঠেও হতে পারে।
- পিত্তথলিতে ক্যান্সার - যদিও পিত্তথলিতে ক্যান্সার অন্যান্য ক্যান্সারের তুলনায় কম হয়। কিন্তু পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার জন্য পরবর্তীতে সেখানে ম্যালিগন্যান্সি তথা ক্যান্সারও হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

লক্ষণ দেখে পিত্তথলির পাথর সন্দেহ হলে পেটের আলট্রাসনোগ্রাফী করে রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে এন্ডোস্কোপিক আলট্রাসনোগ্রাফী, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স কোলানজিও প্যানক্রিয়াটোগ্রাফি (এমআরসিপি), এন্ডোস্কোপিক রেট্রোগ্রেড কোলানজিও প্যানক্রিয়াটোগ্রাফি (ইআরসিপি) এবং লিভার ও প্যানক্রিয়াসের এনজাইম সংক্রান্ত কিছু রক্ত পরীক্ষা। অনেকে শল্যচিকিৎসার ভয়ে পিত্তথলির পাথর পুষে রাখেন। এর ফলে পিত্তথলিতে নানা জটিলতা দেখা দেয়, যা জীবনহানির কারণ হতে পারে। ঠিক সময়ে পিত্তথলির পাথরের চিকিৎসা না হলে জন্ডিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস, সেপসিস এবং গ্যাংগ্রিন হতে পারে।

এই সব জটিল অবস্থা এড়িয়ে চলতে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে যথাসময়ে চিকিৎসা করানো জরুরি। এ ধরনের রোগীর খুব গ্যাসের সমস্যা থাকে। সেজন্য অনেক সময় পাকস্থলীর এন্ডোসকোপি করে দেখতে হয় তাতে আলসার হয়েছে কিনা।

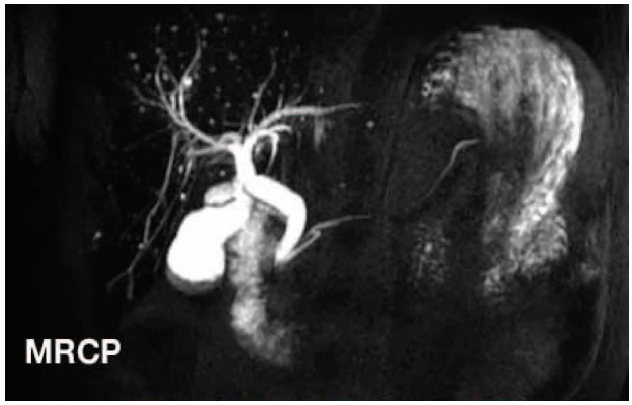

কলিসিস্টাইটিস এর ব্যথা অত্যন্ত তীব্র এবং এমন ব্যথা হলে সাথে সাথে রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত। হেপাটোবিলিয়ারি সার্জন বা জেনারেল সার্জন উভয়েই এই রোগের বিশেষজ্ঞ সার্জন। তাদের তত্ত্বাবধানেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত। রোগটি নিশ্চিত করার জন্য প্রথমেই পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে হয়, সেই সাথে রক্তের কিছু পরীক্ষা, ইসিজি, এক্সরে এই সব পরীক্ষা করে দেখতে হয় ব্যথার অন্য কোনো কারণ আছে কিনা।

চিকিৎসার শুরুতে রোগীকে মুখের সবধরনের খাবার বন্ধ করে স্যালাইন দেয়া হয়, সেই সাথে ব্যথার ওষুধ, গ্যাসের ওষুধ এবং এন্টিবায়োটিকও দেয়া হয়। শতকরা ৯০ ভাগ রোগীই এই চিকিৎসায় সুস্থ বোধ করেন। এরপর চিকিৎসক সময় বুঝে রোগীকে অপারেশন করে পিত্তথলি কেটে ফেলে দেবার (Cholecystectomy) পরামর্শ দেন। প্রায় সময়ই ১ম ভর্তিতেই অপারেশন বা কলিসিস্টেকটমি করে দেয়া হয়। তবে রোগীর অন্য কোনো সমস্যা থাকলে ২-৩ মাস পরেও এটা করা যেতে পারে। পেট কেটে এবং মেশিনের সাহায্যে সামান্য ফুটো করে দুভাবেই কলিসিস্টেকটমি করা যায়। শুধু পিত্তনালীতে পাথর হলে বিশেষ ক্ষেত্রে অপারেশন না করে শুধু ই.আর.সি.পি (ERCP) করেও তা সরিয়ে ফেলা যায়। পিত্তথলিতে পাথর হলে তেমন কিছু করার সুযোগ থাকে না। মনে রাখতে হবে শুধু ওষুধ সেবনে পিত্তথলির পাথর ভালো করে দেয়া সম্ভব নয়, তাই এ ধরনের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক হবে না।

পিত্তথলিতে পাথর থেকে গেলে, কোনো শারীরিক কষ্ট না হলেও তা বের করে দেয়া উচিত। কেননা এর থেকে পরে আচমকা বিপদ আসার সম্ভাবনা প্রবল। তবে রোগীর যদি অন্যান্য শারীরিক সমস্যা, যেমন- উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হাঁপানি বা ফুসফুসের অন্যান্য অসুখ থাকে, চিকিৎসার সাহায্যে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে তবেই অস্ত্রোপচারের কথা ভাবা হয়। খুব বেশি বয়সের গুরুতর অসুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা করা একান্তই দরকার কিনা তা ভালো করে দেখে নিতে হয়।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির সাহায্যে পাথরসহ পিত্তথলি শরীরের বাইরে বের করে দেয়া হয়। ল্যাপারোস্কোপি পদ্ধতির সাহায্যে অস্ত্রোপচার করলে রোগী তিন দিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। দিন দশেকের মধ্যে অনায়াসে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারে। এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করলে ব্যথা যন্ত্রণা প্রায় হয় না বললেই চলে। পেটে দাগও থাকে না। তবে জটিল কয়েকটি ক্ষেত্রে পিত্তথলি যদি পিত্তনালী বা পাকস্থলীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তবে ওপেন সার্জারি করতে হতে পারে।

পিত্তথলির পাথরের অস্ত্রোপচারের পরে পেটে ব্যথা হলে অনেকে ভাবেন যে, আবার বোধ হয় পাথর হয়েছে। যেহেতু শল্যচিকিৎসা করে পাথরসহ পিত্তথলি বের করে দেয়া হয়, অতএব আবার পাথর হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। ল্যাপারোস্কোপি সার্জারির পর অনেকে কাঁধে ব্যথার কথা বলেন। আসলে এই পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচারের সময় পেটে কিছুটা কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করানো হয়। অস্ত্রোপচারের সুবিধার জন্যই এটা করা হয়। তবে নিয়ম মেনে না করলে কাঁধে ব্যথার সম্ভাবনা থাকে।

মনে রাখতে হবে, বাইল বা পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাবার হজমে সাহায্য করে। অতএব পিত্তথলির পাথর এড়াতে এবং এই রোগ হলে কিংবা অস্ত্রোপচারের পরে হালকা খাবার খাওয়া উচিত। বেশি তেল চর্বিযুক্ত খাবার, ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলা উচিত। স্যুপ, ডাল, তরকারি, সালাদ, মুরগির গোশত, মাছ ইত্যাদি সবধরনের খাবারই খাওয়া যেতে পারে। মৌসুমি শাক-সবজি ও ফল খেতে হবে নিয়ম করে। তাহলেই ভালো থাকা যাবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির অবদান

চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি জীবন কে করেছে উন্নত ও প্রসারিত। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির অবদান অপরিসীম। চিকিৎসা প্রযুক্তি, চিকিৎসার গুনাগুন ও কার্যকারিতা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্ভর করে আছে এই চিকিৎসা প্রযুক্তির উপর। মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চিকিৎসা প্রযুক্তির সুবিধা ব্যবহার করে আসছে বাসায়, ডাক্তার চেম্বারে, বিভিন্ন হাসপাতালে। হুইল চেয়ার, পেসমেকার, অর্থোপেডিক জুতা, কনট্যাক্ট লেন্স, ইনসুলিন পেন, হিপ প্রসথেসিস, এমআরআই, লাইফ সাপোর্ট মেশিন, পিইটি আজ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজ বিশ্বে প্রায় ৫০ হাজার এর বেশি মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে যা কেবলই প্রযুক্তির অবদান। প্রতিদিন নতুন নতুন আবিষ্কার স্বাস্থ্য সেবাকে আরও উন্নত করেছে।

এন্টি ব্লিডিং জেল (Anti Bleeding Gel)

বিজ্ঞানী ল্যান্ডোলিনা (Landolina) এবং আইজ্যাক মিলার (Isac Miler) আবিষ্কার করেছেন ভেটিজেল। এটি একটি ক্রিম জাতীয় বস্তু যা ক্ষতকে ভরাট করে এবং রক্ত জমাট প্রক্রিয়া শুরু করে। এই রক্তক্ষরণ বিরোধী জেল যা সিনথেটিক কাঠামো তৈরি করে আমাদের শরীরে Extracellular Matrix এর মত কাজ করে। বিজ্ঞানী ল্যান্ডোলিনা এই জেল ব্যবহার করে ক্যারোটিড রক্তনালীর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সফল হয়েছেন। এছাড়া লিভারের ক্ষত জনিত রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সফল হয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীরা আশাবাদী যে, এই জেলের মাধ্যমে রক্তক্ষরণ জনিত মৃত্যুহার কমানো সম্ভব। যদি এই পণ্যটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয় তবে এটি যুদ্ধাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে।

ইলেক্ট্রন এসপিরিন (Electron Aspirin)

মাইগ্রেন, ক্লাস্টার মাথা ব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী মাথা ব্যথা, মুখের ব্যথা সাধারণ মানুষের জীবনকে কষ্টদায়ক করে তোলে। পূর্বে সাধারণত চিকিৎসার জন্য এসপিরিন ব্যবহৃত হত। এই সব ব্যথা সাধারণভাবে ফেসিয়াল নার্ভ এবং স্ফেনোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন এর প্যাথলজির কারণে হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তাই বিজ্ঞানীরা একটি স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন যেটা মাথা ব্যথার প্রথম সিগন্যালকে বন্ধ করে দেয়। এই ডিভাইসটি স্থায়ীভাবে উপরের চোয়াল অথবা মাথার পাশে বসানো হয়। এই ডিভাইসের একটি অংশ স্ফেনোপ্যালটাইন গ্যাংলিয়ন-এ লাগানো থাকে। রোগী যখন মাথা ব্যথা প্রথম অনুভব করে তখন রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ডিভাইসটি চালু করে। ফলে ডিভাইসের টিপ হতে ওষুধ বের হয় এবং ব্যথার পথকে বন্ধ করে দেয়।

রোবটের মাধ্যমে হেল্‌থ চেকআপ

সারাবিশ্বে টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যাপক প্রসার হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কার হল রোবটের মাধ্যমে হেলথ্ চেকআপ। বিজ্ঞানীরা এমন একটি রোবট আবিষ্কার করেছে, যে প্রতিদিন হাসপাতালে রাউন্ড দিবে, রোগীকে পরীক্ষা করবে, বিভিন্ন গুরুত্বপর্ণ প্যারামিটার যেমন ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, ইউরিন আউটপুট ইত্যাদি রেকর্ড করবে। রোবট এসব কাজ মানুষের সাহায্য ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে থাকে।

নিউরোমডুলেশান স্টিমুলেটর (Neuromodulation Stimulator)

মস্তিষ্ক শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি এমন একটি অঙ্গ যাতে সামান্য আঘাতের কারণে শরীরের অনেক কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। যাদের মস্তিষ্কে আঘাত জনিত ক্ষত থাকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী রিহ্যাবিলেটেশন দরকার। দীর্ঘমেয়াদী রিহ্যাবিলেটেশনের মাধ্যমে রোগী আবার পূর্বের মত কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। মানুষের জিহ্বা হাজারো নার্ভ ফাইবার দিয়ে মস্তিষ্কের সাথে লাগানো থাকে। এই নার্ভ কানেকশনকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যার নাম Neuromodulation Stimulator। এই যন্ত্র জিহ্বার নির্দিষ্ট অংশে লাগানো হয় এবং সেই অংশের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে। এভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতজনিত অকেজো অংশ কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে পারকিনসন, স্ট্রোক এবং মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস রোগের চিকিৎসা সফলভাবে করা হচ্ছে।

রোবোটিক সার্জারি

রোবোটিক সার্জারি একটি পদ্ধতি যাতে সার্জন দুরবর্তী অবস্থান থেকে একটি রোবটের সাহায্যে সার্জারি সম্পাদন করে থাকেন। কম্পিউটার চালিত রোবট দিয়ে দুরবর্তী অবস্থান হতে এ কাজটি করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সার্জারি এই পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ

১. করোনারি আর্টারি বাইপাস
২. পিত্তথলির অপসারণ
৩. হিপ প্রতিস্থাপন
৪. জরায়ু অপসারন
৫. কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট
৬. মাইট্রাল ভালভ মেরামত
৭. প্রোষ্টেট অপসারন
৮. পাইলোপ্লাষ্টি
৯. পাইলোরোপ্লাষ্টি
১০. টিউবাল লাইগেশন

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাকে যেমন করেছে সহজ তেমনি মানব জাতিকে করেছে আরও উন্নত। আমরা যদি সফলভাবে সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি তাহলে মানুষের মৃত্যুহার কমানো সম্ভব।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

ফোনা™ প্লাস জেল
এডাপালিন এবং বেনজোইল পারঅক্সাইড

উপাদান

প্রতি গ্রাম **ফোনা™ প্লাস** জেল-এ রয়েছে এডাপালিন বিপি ১ মি.গ্রা. এবং বেনজোইল পারঅক্সাইড বিপি ২৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

ফোনা™ প্লাস জেল-এ রয়েছে এডাপালিন এবং বেনজোইল পারঅক্সাইড যা ব্রণের কার্যকরী চিকিৎসায় নির্দেশিত। এডাপালিন রেটিনয়েড রিসেপ্টরের সাথে আবদ্ধ হয় কিন্তু সাইটোসোলিক প্রোটিন রিসেপ্টরের সাথে বন্ধন তৈরী করে না। বায়োকেমিক্যাল এবং ফার্মাকোলজিক্যাল প্রোফাইল স্টাডিজ থেকে দেখা যায়, এডাপালিন একটি সক্রিয় ত্বরান্বিতকারী পদার্থ যা কোষসমূহের বিভাজন প্রক্রিয়া, কেরাটিনাইজেশন এবং প্রদাহ উৎপন্নকারী প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এডাপালিন সুনির্দিষ্টভাবে রেটিনয়িক এসিড নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরের সাথে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে এপিথেলিয়াম কোষসমূহে বিভাজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে মাইক্রোকমেডোনের গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেনজোইল পারঅক্সাইড একটি জারক যার ব্যাকটেরিয়ানাশক এবং কেরাটোলাইটিক প্রভাব রয়েছে।

নির্দেশনা

যাদের বয়স ১২ বছর বা তার উর্দ্ধে তাদের ব্রণের চিকিৎসায় **ফোনা™ প্লাস** জেল নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহারযোগ্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

আক্রান্তস্থান ভালভাবে পরিষ্কার করে জেল-এর পাতলা আবরণ মুখমন্ডল অথবা ধড় এর ত্বকে প্রতিদিন একবার ব্যবহার করতে হবে। মুখমন্ডল (যেমন- কপাল, চিবুক, গাল) এর প্রতিটি আক্রান্তস্থানে অল্প পরিমান জেল ব্যবহার করতে হবে। চোখ, ঠোঁট এবং মিউকাস ঝিল্লিতে ব্যবহার করা যাবে না।

ফোনা™ প্লাস জেল চোখ এবং যোনী পথে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতি নির্দেশনা

জেল-এ ব্যবহৃত উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা

ফোনা™ প্লাস জেল ব্যবহার কালে সূর্যের আলো হতে দূরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে সানস্ক্রীন ব্যবহার করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

ইরাইথেমা, ত্বকের উপরিভাগের স্তর উঠে যাওয়া, শুষ্কতা, ক্ষত / তাপে প্রদাহ দেখা যেতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ত্বক শুষ্ক হওয়া, সংস্পর্শজনিত চর্ম প্রদাহ, প্রয়োগকৃত স্থানে প্রদাহ, প্রয়োগকৃত স্থানে অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং ত্বকের অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ধরনের ব্রণের ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এর ফলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে যে সব ওষুধ ব্যবহারে ত্বকের উপরিভাগের স্তর উঠে যায় এবং ত্বকের ক্ষয় করে।

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশি হলে গর্ভকালীন অবস্থায় প্রয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে। এডাপালিন অথবা বেনজোইল পারঅক্সাইড মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

১২ বছর বয়সের নীচে এডাপালিন এবং বেনজোইল পারঅক্সাইড জেল ব্যবহারের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা (২৫° সে. এর নীচে) স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। ব্যবহারের পর টিউবটি ভালভাবে লাগিয়ে রাখুন।

সরবরাহ

ফোনা™ প্লাস জেল : প্রতি প্যাক-এ আছে ১০ গ্রাম জেল ল্যামিনেটেড টিউবে।

ক্লিনফেস® জেল
ক্লিন্ডামাইসিন ফসফেট এবং ট্রেটিনইন ইউএসপি

উপাদান

ক্লিনফেস® জেল : প্রতি গ্রাম জেল-এ আছে ক্লিন্ডামাইসিন ফসফেট ইউএসপি ১২ মি.গ্রা. এবং ট্রেটিনইন ইউএসপি ০.২৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

ক্লিনফেস® জেল একটি লিনকোস্যামাইড এন্টিবায়োটিক ক্লিন্ডামাইসিন ফসফেট এবং রেটিনয়েড ট্রেটিনইনের সংমিশ্রণ। ক্লিন্ডামাইসিন ব্যাকটেরিয়ার ৫০ রাইবোসোমাল সাবইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে পেপটাইডাল রূপান্তর-এ বাধা প্রদানের মাধ্যমে প্রোটিন শৃঙ্খলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয়। ক্লিন্ডামাইসিন *Propionibacterium acnes* নামক জীবাণুর কার্যক্রিয়াকে বাধা দেয়, যার ফলে ব্রণের সংক্রমণ হ্রাস পায়। ট্রেটিনইন ফলিকুলার এপিথেলিয়াল কোষের সংযুক্তি কমিয়ে দেয় এবং টার্ন ওভার বাড়ানোর মাধ্যমে কমেডোন বের করে দেয়।

নির্দেশনা

ক্লিনফেস® জেল ব্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি

ঘুমানোর আগে

- সাবান ও মৃদু গরম পানি দিয়ে মুখ পরিস্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে জেল নিয়ে মুখের ত্বকে আলতো করে লাগাতে হবে।

সকালে

- মুখের ত্বকের জেল প্রয়োগের পরে সানস্ক্রীন ক্রীম লাগাতে হবে।
- সারাদিনের ২-৩ বারের বেশী মুখ ধোয়া উচিত নয় এবং সানস্ক্রীন ক্রীম প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

যাদের ক্লিন্ডামাইসিন ও ট্রেটিনইন অথবা জেল-এ উপস্থিত যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

সতর্কতা

নাক, ঠোঁট, কান ও ক্ষত স্থানে ক্লিন্ডামাইসিন ও ট্রেটিনইন ব্যবহার করা উচিত নয়। জেল প্রয়োগের পরে সূর্যের আলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

ইরাইথেমা, চুলকানি, ন্যাসোফেরেনজাইটিস, ত্বকের শুষ্কতা, কাশি, সাইনোসাইটিস ও ডায়রিয়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ত্বকের ব্যবহারে তীব্র শুষ্ককারক ভূমিকা রয়েছে যেমন- সাবান, ক্লিনজার, বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী এবং অধিক ঘনত্বপূর্ণ অ্যালকোহলীয় সামগ্রী ইত্যাদির সাথে একত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ইরাইথ্রোমাইসিন এন্টিবায়োটিকের সাথে একত্রে ব্যবহারে ক্লিন্ডামাইসিন এবং ইরাইথ্রোমাইসিন উভয় ওষুধের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

নিউরোমাসকুলার ওষুধের সাথে ক্লিনডামাইসিন একত্রে ব্যবহারে নিউরোমাসকুলার ওষুধের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অতএব একত্রে ব্যবহারের সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার

ত্বকীয় ক্লিন্ডামাইসিন ও ট্রেটিনইন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হওয়ার কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ক্লিন্ডামাইসিন ও ট্রেটিনইন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে

১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ক্লিন্ডামাইসিন ও ট্রেটিনইন জেল ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে (২৫° সে. তাপমাত্রার নীচে) রাখুন। ফ্রিজে রাখবেন না।

সরবরাহ

ক্লিনফেস® জেল: প্রতিটি লেমিনেটেড টিউবে আছে ১৫ গ্রাম জেল।

ম্যাগান্টা™ প্লাস

মেগালড্রেট ইউএসপি ও সিমেথিকন ইউএসপি

উপাদান

ম্যাগান্টা™ প্লাস ট্যাবলেট : প্রতিটি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেটে আছে মেগালড্রেট ইউএসপি ৪৮০ মি.গ্রা. ও সিমেথিকন ইউএসপি ২০ মি.গ্রা.।

ম্যাগান্টা™ প্লাস সাসপেনসন : প্রতি ৫ মি.লি. সাসপেনসনে আছে মেগালড্রেট ইউএসপি ৪৮০ মি.গ্রা. ও সিমেথিকন ইউএসপি ২০ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

মেগালড্রেট গ্যাস্ট্রিক অম্ল প্রশমন করার মাধ্যমে পাকস্থলী ও ডিওডেনাল বাল্ব- এ pH মাত্রা বাড়ায়। এটা নিম্ন ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টার-এর টোন বাড়ায় ও কোমল পেশীয় সংকোচন ও দ্রুত পাকস্থলী খালি হওয়া রোধ করে। সিমেথিকন পাকস্থলীতে গ্যাসীয় বুদবুদ ভেঙ্গে দেয় ফলে গ্যাস নিঃসরণ সহজ হয়।

নির্দেশনা

অম্লাধিক্য, গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রাইটিস, বুকজ্বালা, বদহজম, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। এছাড়া পেট ফাঁপা, পেট ফোলা এবং খাদ্যনালীতে বায়ুজনিত ব্যথারোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি

ম্যাগান্টা™ প্লাস ট্যাবলেট: ১-৪ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট, আহারের ২০-৬০ মিনিট পরে এবং রাতে ঘুমানোর আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

ম্যাগান্টা™ প্লাস সাসপেনসন: ২-৪ চা-চামচ, আহারের ২০-৬০ মিনিট পরে এবং রাতে ঘুমানোর আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

প্রতি নির্দেশনা

রুদ্ধ আন্ত্রিকনালী, বৃক্কীয় অকার্যকারিতা, এপেন্ডিসাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সিমেথিকন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, অন্ত্রে ব্যথা।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি-সি। তাই গর্ভাবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘদিন উচ্চ মাত্রায় সেবন পরিহার করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে যথাযথ রোগ নিরুপণ না হওয়া পর্যন্ত ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

সতর্কতা

মেগালড্রেট অথবা সিমেথিকন এর প্রতি এলার্জিক সংবেদনশীলতা, বৃক্কে সমস্যা ও সাইট্রেট লবণ গ্রহনকারী (ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট, এন্টাসিড এবং লাক্সাটিভ) রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক এর সাথে গ্রহণ করা উচিত নয়। এন্টাসিড লৌহসম্বলিত ওষুধের শোষনে বাধা প্রদান করতে পারে।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদেরর নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ম্যাগাল্টা™ প্লাস ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ১০০ টি চুষে খাওয়ার ট্যাবলেট।

ম্যাগাল্টা™ প্লাস সাসপেনসন : প্রতিটি পেট বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনসন।

এরোমাইসিন® লোশন

এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি ৩% w/v

বিবরণ

এরোমাইসিন® লোশন (এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি) একটি ব্যাকটেরিয়াবিরোধী ম্যাক্রোলিড এন্টিবায়োটিক, কিন্তু বেশী মাত্রায় **এরোমাইসিন®** ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করতে পারে। যদিও প্রদাহপূর্ণ ব্রণ হ্রাসের ক্ষেত্রে ত্বকীয় এরিথ্রোমাইসিন কিভাবে কাজ করে জানা যায়নি। ধারণা করা হয় এটি এরিথ্রোমাইসিন এর এন্টিবায়োটিক কার্যকারিতার ফল।

উপাদান

এরোমাইসিন® লোশন-এ আছে এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি ৩% w/v অর্থাৎ প্রতি মি.লি. লোশনে আছে ৩০ মি.গ্রা. এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি।

নির্দেশনা

এরিথ্রোমাইসিন সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়াজনিত ত্বকের সংক্রমণ, ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

আক্রান্ত স্থানে সকাল ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে মুখমন্ডল, কাঁধ, বুক ও পিঠের ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি লোশন মাত্র একবারই ব্যবহার করা উচিত। আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগের পূর্বে গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

- আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে অথবা সরবরাহকৃত প্রয়োগ যন্ত্র দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- ব্যবহার করার পর হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- ক্ষতস্থানে লোশন আলতোভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

এরিথ্রোমাইসিন বা এই ওষুধের যে সকল উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে।

সতর্কতা

শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

চোখ, নাক ও অন্যান্য মিউকাস পর্দা থেকে দূরে রাখতে হবে। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশী হলে তবেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

এরিথ্রোমাইসিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে

১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে এরিথ্রোমাইসিন ব্যবহারের নিরাপত্তা কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ক্লিনডামাইসিনের সাথে এরিথ্রোমাইসিন এর ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন হয়।

সংরক্ষণ

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। আলো থেকে দূরে রাখুন।

সরবরাহ

এরোমাইসিন® লোশন : প্রতিটি বোতলে রয়েছে ২৫ মি.লি. লোশন। সঙ্গে রয়েছে একটি জালিযুক্ত ছিপি ও একটি সংরক্ষণ ছিপি।

ব্যবহারের নিয়মাবলী

- ব্যবহারের পূর্বে বোতলটি ঝাঁকিয়ে নিন।
- বোতলের ছিপিটি খুলে ফেলে দিন।
- জালিযুক্ত ছিপিটি বোতলের মুখে লাগিয়ে দিন।
- ব্রণ আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেয়ার পর হালকাভাবে লোশনটি ঘষে লাগান।
- ব্যবহারের পর বোতলের সংরক্ষণ ছিপিটি ভালভাবে লাগিয়ে রাখুন।

বুক জ্বালাপোড়া ও গ্যাস্ট্রিক আলসার দ্রুত নিরাময়ে

স্কয়ার নিয়ে এলো-

Rabeca™ 20 *Tablet*

Rabeprazole Sodium 20 mg

দ্রুত কার্যকর এন্টি-আলসারেন্ট

রজঃ চক্র জনিত বিভিন্ন সমস্যার কার্যকরী চিকিৎসায়

Menoral®

Norethisterone 5 mg Tablet

DEDICATED MANUFACTURING FACILITY FOR HORMONE & STEROID PRODUCTS

- কার্যকরী প্রজেস্টেরন
- রজঃ চক্র জনিত বিভিন্ন সমস্যায় অত্যন্ত কার্যকরী
- দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় অন্যান্য প্রজেস্টেরনের তুলনায় নিরাপদ

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

Find us on:
www.squarepharma.com.bd
facebook.com/SquarePharmaLtd
twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

Renorma™

Tibolone 2.5 mg Tablet

Re-normalizes menopausal symptoms

রিনর্মা™ মেনোপজের বিভিন্ন লক্ষণের চিকিৎসায় কার্যকর

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

Find us on:
www.squarepharma.com.bd
facebook.com/SquarePharmaLtd
twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার্স: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৮৮৩৩০৪৭-৫৭, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web : http://www.squarepharma.com.bd

Production Swarup Art